যার সমর্থন পাওয়া যাবে। ভারতীয় দর্শনে শ্রেয়
সুখলাভের আদর্শ থেকে পৃথক করেছেন। যে
পরপারে নিয়ে যায়, যা আত্মোপলব্ধির মহিমায় ভাস্বর তাই ভারতীয় দর্শনে শ্রেয়
নামে অভিহিত হয়েছে। আত্মোপলব্ধি মানুষের শ্রেয়। জাগতিক তৃপ্তিকে বলা হয়েছে
'প্রেয়'। প্রেয়লাভের ফলে আত্মোপলব্ধি হয় না। যে ব্যক্তি প্রেয় ও শ্রেয়ের পার্থক্য
সম্পর্কে অবহিত তিনিই প্রাজ্ঞ। বিভিন্ন নৈতিক আদর্শে যে মূল্যবোধ প্রতিফলিত
হয়েছে তা এইভাবে দুটি ভিন্ন বর্গের আদর্শ।

সুতরাং একথা অবশ্যই বলা চলে যে ভারতীয় নীতিবিদ্যা মানুষকে শুধু যে সুন্দর
চরিত্র লাভের অধিকারী করতে চেয়েছে তাই নয়। তাকে যুক্তির পথে এগিয়ে
যেতেও উদ্বুদ্ধ করেছে। বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার পঞ্চশীল বা অহিংসাব্রত, অথবা জৈন
নীতিবিদ্যার অনুব্রত মূলত সাধারণ মানুষকে চরিত্রবান করার নীতি। যে কোন
মানুষের পক্ষে হয়তো মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। তবে মুক্তিকামী মানুষের চারিত্রিক
শুদ্ধতার প্রয়োজন আছে। যেমন, যে ব্যক্তি শীল আচরণ করে না বা অহিংস নয়
তার পক্ষে নির্বাণ বা মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। জৈন নীতিবিদ্যায় অনুব্রতের উচ্চতর
পর্যায়ে আছে মহাব্রতের অনুশাসন যা মানুষকে ক্রমশ মুক্তির পথে নিয়ে যেতে
পারে। নির্বাণ বা মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নীতিবিদ্যার আধ্যাত্মিক আদর্শ নয়, তার
নৈতিকতারও আদর্শ। তাই যেখানেই ভারতীয় দার্শনিক নৈতিক আদর্শের কথা
বলেছেন সেখানেই তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন এক আধ্যাত্মিক আদর্শের
দিকে। নৈতিক আদর্শ তাই ভারতীয় দর্শনে শুধুই সামাজিক আদর্শ নয়। ভারতীয়
দর্শনে নৈতিকতার ধারণা এইভাবে আধ্যাত্মিকতায় পরিণতি লাভ করেছে।

পুরুষার্থ

ভারতীয় দর্শনে মানবজীবনের একাধিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে যাদের
একত্রে বলা হয় 'পুরুষার্থ'। 'পুরুষার্থ' কতকগুলি আদর্শ যা মূলত নৈতিক

ব্যুৎপত্তিগতভাবে বলা হয় যে মানুষ যা প্রার্থনা করে, যে আদর্শকে তার কাম্য বা অভীষ্ট বলে মনে করে তাই পুরুষার্থ। মীমাংসাসূত্রে বলা হয়েছে— 'যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থলক্ষণম্।' অর্থাৎ যেখানে বা যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি নিহিত থাকে তার কামনাই পুরুষার্থ।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে পুরুষার্থ চার প্রকার— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অবশ্য পুরুষার্থের সংখ্যা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। অনেকের মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। কোন কোন প্রাচীন রচনায় এই ত্রিবর্গকেই পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে চতুর্থ পুরুষার্থ 'মোক্ষ' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে **চতুর্বর্গ** বলা হয়।

চার্বাক দার্শনিকের কাছে 'কাম'ই একমাত্র পুরুষার্থ। 'অর্থ' কাম চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। যারা ত্রিবর্গ স্বীকার করেন তাঁদের মতে শুধু অর্থ নয়, ধর্মও কামসিদ্ধির উপায়; অর্থাৎ এই মতে কামই আসল লক্ষ্য। যারা চতুর্বর্গে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে মোক্ষই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ধর্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষলাভের উপায়। ত্রিবর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে অনেক ধর্ম ও অর্থকে কামের তুলনায় শ্রেয় বলেছেন। আবার অনেকের কাছে কাম ও অর্থই শ্রেয়। কারও কারও দৃষ্টিতে ধর্মই একমাত্র শ্রেয়।

চতুর্বিধ পুরুষার্থ আমাদের প্রার্থিত কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি মানুষের মুখ্য প্রয়োজন। বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পুরুষার্থই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির উপায়। একথা অনস্বীকার্য যে সাধারণ মানুষ পার্থিব সুখেরই কামনা করে। 'কাম' শব্দটি জৈব তৃষ্ণার নিবৃত্তিজনিত সুখকে বোঝায়। জৈব কামনা পরিতৃপ্ত হলে সুখ উৎপন্ন হয়। অর্থ সাক্ষাৎভাবে সুখ উৎপাদন না করলেও তার দ্বারা কাম তৃপ্ত হয়।

অর্থ ও কাম মানুষের দুটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম। বৈদিক ভাবনা অনুসারে পার্থিব ভোগস্পৃহা নিন্দনীয় হতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে অবশ্য অসংযত ভোগলিপ্সাকে অনুমোদন করা হয়নি। অর্থ ও কাম যখন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তখন যে সুখ লাভ হয় তাই কাম্য। যাই হোক, অর্থ ও কাম যে পুরুষের অভীষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ধর্মকে কেন পুরুষার্থ বলা হয়েছে তা বিচার করা প্রয়োজন।

ধর্মকে কি আমরা কামনা করি? এখানে মনে রাখতে হবে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রটি কি। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আনাই ধর্মের কাজ। যে ব্যক্তি কাম এবং অর্থকে আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি প্রকৃত সুখ লাভ করেন না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে

অর্থ ও কাম ধর্ম থেকেই আসে— 'ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ।' একথার অর্থ হল অর্থ বা কাম ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হলেই তা পুরুষার্থরূপ আদর্শরূপে গ্রাহ্য হয়। তাই ধর্মকে সুখের উপায় বলা হয়েছে। আসলে একমাত্র কামই মুখ্য পুরুষার্থ। কাম অন্য কিছু লাভের উপায় নয়। কামের স্বগত মূল্য আছে। কিন্তু অর্থ ও ধর্ম এই দিক থেকে গৌণ পুরুষার্থ— কারণ তারা সুখলাভের উপায়। ধর্ম ও অর্থ কামের সহায়ক।

সুতরাং ত্রিবর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই তিনটি পুরুষার্থ একপ্রকার নয়। তাদের মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ। একমাত্র কামই মুখ্য; অর্থ ও ধর্ম গৌণ। কিন্তু চতুর্বর্গের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলেছেন। ত্রিবর্গের অন্তর্গত পুরুষার্থগুলি মোক্ষেরই সহায়ক। ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম মানুষকে মোক্ষাভিমুখী করে। এই দিক থেকে বিচার করলে মোক্ষকেই মুখ্য পুরুষার্থ বলা উচিত।

যদিও বলা হয় যে পুরুষার্থগুলি আমাদের কাম্য বা অভীষ্ট অর্থাৎ প্রতিটি পুরুষার্থই সুখপ্রাপ্তির সহায়ক তাহলেও একথা গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। ধর্ম, অর্থ ও কাম মানুষের কামনা সিদ্ধ করে এবং সুখ উৎপাদন করে। কিন্তু মোক্ষ কামনার অতীত অবস্থা। মোক্ষাবস্থায় কামনার সিদ্ধি ও তজ্জনিত সুখলাভের অবকাশ নেই। তাই মোক্ষ ত্রিবর্গকে পূর্ণতা দান করে একথা সত্য নয়। ত্রিবর্গ এবং মোক্ষের মধ্যে স্বরূপগত ব্যবধান আছে।

এই আশঙ্কার উত্তরে অনেকে বলেছেন যে মোক্ষ কামনাশূন্য অবস্থা হলেও তার সঙ্গে ত্রিবর্গের আত্যন্তিক ব্যবধান আছে একথা মনে করার কোন হেতু নেই। যে কাম ও অর্থ ধর্মের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ তার সিদ্ধিকেই মানুষের জীবনধারণের সহায়ক বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে কাম এবং অর্থের গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করা হয়নি। তার কারণ হিন্দু দার্শনিক চিন্তায় জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান স্বীকার করা হয়নি। তার কারণ এই মতে কামের সিদ্ধি যদি ধর্মবিরোধী না হয় তাহলে তাই মানুষকে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করতে পারবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে কামস্বরূপ বলেছেন যা অবশ্যই ধর্মবিরোধী নয় (৭-১১)। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই সাধনা করা উচিত। কিন্তু অর্থ ও কাম যদি ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী হয় তাহলে তাদের পরিত্যাগ করা উচিত। এর থেকে বোঝা যায় যে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থই প্রকৃত পুরুষার্থ এবং তাদের সাধনাই মানুষকে মোক্ষাভিমুখী করে তুলতে পারে। সুতরাং ত্রিবর্গের সম্পূর্ণতা মোক্ষেই— একথা বলা অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

অনেক ভাষ্যকার এখানে একটি সমস্যা লক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে ধর্ম, অর্থ ও কামের সঙ্গে মোক্ষের ধারণার এক জায়গায় বৈসাদৃশ্য আছে। ধর্ম এবং ধর্মনিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। ধর্ম সমাজকল্যাণের

আদর্শে কাম ও অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা হয় সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণই ধর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু মোক্ষে অহংবোধেরই বিনাশ হয়। সেখানে সুখ বা কল্যাণসন্ধানী মানুষের জৈবসত্তার বাস্তবতা বিলীন হয়ে যায়। মোক্ষে সেই পুরুষ বা আত্মাই বিরাজ করে যা সুখ-দুঃখ বাসনা-তৃষ্ণার অতীত। মোক্ষ তাই ত্রিবর্গের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

এই আলোচনায় মোক্ষের যে ধারণাটি গৃহীত হয়েছে সেটি বহু আলোচিত প্রাচীন ধারণা। এই প্রাচীন ধারণা অনুসারে মোক্ষাবস্থায় সমস্ত কামনার লয় হয় এবং ব্যক্তির অহংবোধ মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রাচীন মতকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে যার ফলে ত্রিবর্গ ও মোক্ষের দ্বন্দ্ব বা ব্যবধান ঘুচে যায়। আমরা মনে করতে পারি যে মোক্ষে মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রাকৃত রূপ মিথ্যা হয়ে যায় না; বরং মোক্ষাবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বের অভাবনীয় প্রসারণ ঘটে। যে কোন জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবনে আত্মার এই প্রসারকে দেখি যেখানে জৈব বা প্রাকৃত অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা থাকলেও একজন মানুষ মুক্ত থাকেন। তিনি বাসনারহিত নন। কিন্তু তাঁর বাসনা এই প্রাকৃত জীবন যাপনের বাসনা নয়। তাঁর বাসনা মুক্তির বাসনা যা জাগতিক বন্ধনের মধ্যেও বন্ধনহীন থাকে। সুতরাং মোক্ষকে ত্রিবর্গের সঙ্গে অযৌক্তিক সংযোজন বলা হয়তো সঠিক নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অভিযোগের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন কোন মতে ধর্ম, অর্থ ও কামকে সামাজিক আদর্শ বলে মনে করা হয়। কিন্তু মোক্ষের কোন সামাজিক তাৎপর্য নেই। মোক্ষ একজন মুমুক্ষু ব্যক্তির আদর্শ হতে পারে। সেক্ষেত্রে একথা মনে করা অস্বাভাবিক হবে না যে মোক্ষের সংযোজন পুরুষার্থ তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে না। আবার একথাও সত্য যে ধর্ম যদি মোক্ষের সহায়ক হয় তাহলে তার সামাজিক মূল্য থাকে না। মোক্ষাবস্থায় পুরুষের অবস্থাও একথাকে সমর্থন করে। যে মোক্ষলাভ করে সে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব সকল সামাজিক তাৎপর্য হারায়। কারণ মোক্ষ শুভাশুভের অতীত। এই অভিযোগের উত্তর আমরা পেয়েছি। মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ যতদিন বিদেহমুক্ত না হয় ততদিন তার জীবন্মুক্ত অবস্থা যে সামাজিক মূল্য লাভ করে একথা বুদ্ধদেব বা অন্যান্য জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবনেই প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্ম

পুরুষার্থসমূহের মধ্যে ধর্ম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'ধর্ম' শব্দটি যদিও নানার্থবোধক তাহলেও এর একটি মুখ্য অর্থ আছে। 'ধর্ম' শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ হল 'ধারণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ'— অর্থাৎ ধর্ম তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ বা রক্ষা করে।